দেবী জগদ্ধাত্রী : রূপে ও স্বরূপে

প্রসেনজিৎ বসু

সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, বলাগড় বিজয়কৃষ্ণ মহাবিদ্যালয়

জগদ্ধাত্রী বড় রহস্যময়ী দেবী। তাঁর নামে রহস্য, রূপে রহস্য, স্বভাবে ও প্রভাবে রহস্য। তাত্ত্বিকেরা তাঁর নাগাল পান না, ভাবুকেরা পান আশ্রয়।

জগতকে যিনি ধরে রাখেন, তিনিই জগদ্ধাত্রী। অভিধানে 'জগৎ'-এর প্রথম অর্থই তো 'গমনশীল, জঙ্গম।'[১] তাহলে 'জগৎ'-এর মূল ভাব গতি। আর ধাত্রী মানে যিনি ধারণ করেন, ধরে রাখেন। ধরে রাখা হল স্থিতি। তাহলে জগৎ+ধাত্রী=জগদ্ধাত্রী আসলে গতি+স্থিতি=জগদ্ধাত্রী। দেবী একাধারে নাদরূপে অনন্ত বিস্তৃতা এবং বিন্দুরূপে সুস্থিরা। যে-'জগৎ' ক্রমাগতই ঘুরে চলেছে, ছুটে চলেছে, ব্যেপে চলেছে, তাকেও যিনি ধরে রাখতে পারেন—তিনি গতিরও চরম রূপ, স্থিতিরও চরম রূপ, আবার গতি-স্থিতির দ্বৈতভাবের ঊর্ধ্বে যে-তুরীয়াবস্থা, তারও চরম রূপ। এই হলেন জগদ্ধাত্রী।

তাঁর রূপটি কেমন? মায়াতন্ত্রে তাঁর ধ্যানমন্ত্র :

''সিংহস্কন্ধাধিসংরূঢ়াং নানালঙ্কারভূষিতাম্।
চতুর্ভুজাং মহাদেবীং নাগযজ্ঞোপবীতিনীম্॥
শঙ্খচক্র-ধনুর্বাণ-নয়নত্রিতয়ান্বিতাম্।
রক্তবস্ত্রপরিধানাং বালার্কসদৃশীং তনুম্॥
নারদাদ্যৈর্মুনিগণৈঃ সেবিতাং ভবগেহিনীম্।
ত্রিবলীবলয়োপেত-নাভিনালমৃণালিণীম্॥
রত্নদ্বীপমহাদ্বীপে সিংহাসনসমন্বিতে।
প্রফুল্লকমলারূঢ়াং ধ্যায়েত্তাং ভবসুন্দরীম্॥''[২]

বাহ্য অর্থ অনুযায়ী, দেবী সিংহবাহিনী, নানা অলংকারভূষিতা, চতুর্ভুজা এবং নাগযজ্ঞোপবীত-ধারিণী। দেবীর চার হাতে শঙ্খ-চক্র-ধনুর্বাণ। তিনি ত্রিনয়না, পরিধানে রক্তবস্ত্র। দেহকান্তি অরুণবর্ণ। নারদ প্রমুখ মুনিগণকর্তৃক সেবিতা দেবী শিবগৃহিণী। তাঁর নাভি থেকে ত্রিবিধ বলী বলয়াকারে শোভিত। রত্নদ্বীপ মহাদ্বীপে তিনি সিংহাসনা। প্রফুল্ল পদ্মমধ্যে এই শিবসুন্দরী ধ্যেয়া।

দেবীর এই রূপটিতে দেখি রজোগুণের আধিক্য।

তাঁর বাহন সিংহ রাজসিক। তাঁর রক্তবস্ত্র রজোগুণের দ্যোতক। তাঁর গাত্রবর্ণও লাল; রজোগুণাত্মক। বোঝাই যায়, ইনিই রাজার দেবী, বীরের দেবী। তাঁর নাগযজ্ঞোপবীত কুণ্ডলিনীতত্ত্বের প্রতীক।

অস্ত্রের প্রসঙ্গে আসি। শঙ্খ ও চক্র যথাক্রমে নাদ ও কালের প্রতীক। নাদ—যা বিশ্বব্যাপ্ত। কালচক্র—যা অবিরাম ঘূর্ণ্যমান। সর্বস্থান ও সর্বকাল জুড়ে দেবীর অবস্থান।

ধনুর্বাণ নিয়ে বিশেষ আলোচনা প্রয়োজন। পূর্বের মায়াতন্ত্রোক্ত ধ্যানটি ছাড়াও জগদ্ধাত্রীর আরও কয়েকটি ধ্যানান্তর আছে। দেবীর প্রাতঃকালীন পূজার ধ্যানমন্ত্রে বলা হচ্ছে :

''শঙ্খশার্ঙ্গসমাযুক্তাং বামপাণিদ্বয়ে তথা।
চক্রঞ্চ পঞ্চবাণাংশ্চ ধারয়ন্তীঞ্চ দক্ষিণে॥''[৩]

এখানে দেবীর ধনুটিকে বিশেষভাবে বলা হল শার্ঙ্গধনু এবং বাণকে বলা হল পঞ্চবাণ। পঞ্চবাণ ধারণ করেন কামদেব এবং কামেশ্বরী। কামদেবের পঞ্চবাণ পঞ্চপুষ্পবিনির্মিত—

''অরবিন্দমশোকঞ্চ চুতঞ্চ নবমল্লিকা।
রক্তোৎপলঞ্চ পঞ্চৈতে পঞ্চবাণস্য সায়কাঃ॥''[৪]

—পদ্ম, অশোক, আম্রমঞ্জরী, নবমল্লিকা ও রক্তোৎপল—এই পঞ্চবিধ পুষ্পে কামদেবের বাণসমূহ নির্মিত। এই পঞ্চবাণের ক্রিয়াও পঞ্চবিধ।

''সম্মোহনোন্মাদনৌ চ শোষণস্তাপনস্তথা।
স্তম্ভনশ্চেতি কামস্য পঞ্চ বাণাঃ প্রকীর্তিতাঃ॥''[৫]

এই পঞ্চবাণ দ্বারা কামদেব সম্মোহন, উন্মাদন, শোষণ, তাপন এবং স্তম্ভন কার্য সম্পাদন করেন।

দেবী কামেশ্বরী ললিতা ত্রিপুরসুন্দরীও পঞ্চবাণধারিণী। তাঁর পঞ্চবাণের অর্থ গূঢ়তর। 'ললিতাসহস্রনাম' স্তোত্রে দেবীর একাদশ সংখ্যক নামটি হল 'পঞ্চতন্মাত্রসায়কা'। ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, ''Salutations to Her who holds five arrows representing the five Tanmatras (subtle elements).''[৬] কী এই পঞ্চ তন্মাত্র? ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম—এই স্থূল পঞ্চ ভূতের যে-সূক্ষ্মরূপ এবং মূলধর্ম, তাই পঞ্চ তন্মাত্র। যথা—গন্ধ (ক্ষিতি), রস (অপ), রূপ (তেজ), স্পর্শ (মরুৎ) এবং শব্দ (ব্যোম)। দেবী এই পঞ্চ তন্মাত্র-স্বরূপ পঞ্চবাণ ধারণ করেন।

কাম ও কামেশ্বরীর পঞ্চবাণতত্ত্ব স্মরণে রেখে ফিরে যাই জগদ্ধাত্রীর কাছে। দেবী জগদ্ধাত্রী স্থূল ও সূক্ষ্ম উভয়বিধ জগতের অধীশ্বরী। তাঁর পঞ্চবাণ সেই দ্বিবিধ ঐশ্বর্যের দ্যোতক। স্থূল জগতের জীবনচক্র সঞ্চালনের জন্য কাম অনিবার্য উপাদান। তাই দেবীর হাতে পঞ্চবাণ। ধ্যানে তাঁর 'ভবসুন্দরী' অভিধাটি লক্ষণীয়। তিনিই শিবকামসুন্দরী। অধিকারী সাধক জানেন, তান্ত্রিক পূজার সামান্যকাণ্ডে যে-কামিনী দেবীর ধ্যান করা হয়, তাঁর সঙ্গে জগদ্ধাত্রীর কী আশ্চর্য রূপসাদৃশ্য! আবার এই জগদ্ধাত্রীই পঞ্চতন্মাত্র রূপ বাণসমূহে সূক্ষ্মজগৎও নিয়ন্ত্রণ করছেন। জগদ্ধাত্রীস্তোত্রে স্পষ্টতই বলা হয়েছে—

''পরমাণুস্বরূপে চ দ্ব্যণুকাদিস্বরূপিণি।
স্থূলাতিসূক্ষ্মরূপে চ জগদ্ধাত্রী নমোঽস্তু তে॥
সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মরূপে চ প্রাণাপানাদিরূপিণী।''[৭]

অর্থাৎ দেবী পরমাণুস্বরূপা, স্থূলাতিসূক্ষ্মরূপা এবং সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মরূপা।

এবার ধনু প্রসঙ্গ। শার্ঙ্গধনু। এটি ভগবান বিষ্ণুর ধনুকের নাম। আমাদের মনে পড়বে 'শ্রীশ্রীচণ্ডী'র একাদশ অধ্যায়ের বিখ্যাত নারায়ণীস্তুতি :

''শঙ্খচক্রগদাশার্ঙ্গগৃহীতপরমায়ুধে।
প্রসীদ বৈষ্ণবীরূপে নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥''

দেবী বৈষ্ণবী শঙ্খ, চক্র, শার্ঙ্গধনু ধারিণী। জগদ্ধাত্রীও তাই। বিষ্ণুর সঙ্গে জগদ্ধাত্রীর যোগ অতি নিবিড়। একজন জগৎপতি জগন্নাথ। অন্যজন জগদ্ধাত্রী। একজন জগতের পালনকারী, অন্যজন ধারণকারিণী। বস্তুত উভয়েই অভেদ। সেই কারণেই জগদ্ধাত্রীকে নারদাদিমুনিসেবিতা বলা হয়েছে। নারদ প্রসিদ্ধ বিষ্ণুভক্ত। কিন্তু বিষ্ণু ও জগদ্ধাত্রীকে

অভেদজ্ঞানেই তিনি দেবীর সেবা করেন।

দেবী ও বিষ্ণুর সম্বন্ধটি আর একটু পর্যালোচনা-যোগ্য। জগদ্ধাত্রী বৈষ্ণবী, কিন্তু বিষ্ণুর অধীনা অর্থে বৈষ্ণবী নন। বরং বিষ্ণুর সামূহিক শক্তিস্বরূপা অর্থে বৈষ্ণবী। তিনিই বিষ্ণুর অধীশ্বরী। এই তত্ত্ব বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে একটি তন্ত্র এবং একটি পুরাণ দ্বারা। মায়াতন্ত্র এবং মহাভাগবতপুরাণ।

মায়াতন্ত্রের প্রথম পটলেই বলা হয়েছে, সৃষ্টির আদিতে বিশ্ব যখন একার্ণবে পরিব্যাপ্ত ছিল, তখন জগৎপতি বিষ্ণু একটি বটপত্রে সেই মহাসমুদ্রে ভাসমান ছিলেন। এই বটপত্রটিই সাক্ষাৎ মহামায়া। বিষ্ণু স্বয়ং বলছেন,

''বটপত্রস্বরূপা ত্বং যতো মাং বিধৃতাম্ভসি।
অতো ধর্মস্বরূপাসি জগত্যস্মিন্ সনাতনি॥''[৮]

—হে সনাতনি! বটপত্ররূপে তুমি আমাকে যেমন জলের উপর ধারণ করে আছ, তেমনই ধর্মস্বরূপা তুমি এই জগতকে ধারণ কর।

অনুরূপ উল্লেখ পাচ্ছি মহাভাগবতপুরাণেও। সেখানে প্রজাপতি ব্রহ্মা রামচন্দ্রকে মহাদুর্গা জগদ্ধাত্রীর মহিমা প্রসঙ্গে বলছেন,

''জগদাধারাভূতা সা সর্বলক্ষণকারিণী॥...
সৈব সিন্ধৌ নিমগ্নস্য বিষ্ণোঃ সংরক্ষণায় বৈ॥
বটপত্রময়ী ভূত্বা তং দধার মহাম্ভসি।''[৯]

—সেই দেবী জগদাধারভূতা, সর্বরক্ষণকারিণী,... আর তিনিই সিন্ধুনিমগ্ন বিষ্ণুর রক্ষার জন্য বটপত্রময়ী হয়ে জলরাশির মধ্যে তাঁকে ধারণ করেছিলেন। অতএব জগদ্ধাত্রী কেবল জগতকে ধারণ ও রক্ষা করেন না, স্বয়ং জগৎপতি নারায়ণকেও ধারণ তথা রক্ষা করেন।

ধ্যানমন্ত্রে দেবীকে বলা হয়েছে 'ভবগেহিনী'। ভারি মধুর এই নামটি। ভব অর্থে শিব। দেবী তাই শিতিকণ্ঠকুটুম্বিনী শিবগৃহিণী। আবার ভব শব্দের অন্য অর্থ সংসার। ভবসংসার। এই মহাবিরাট ভবসংসার যেন একটি গৃহ। আর সেই গৃহের গৃহিণী—সেই বাড়ির গিন্নিমা হলেন আমাদের জগদ্ধাত্রী। তিন ভুবন জোড়া এই একান্নবর্তী পরিবারের তিনি ভর্ত্রী-কর্ত্রী-বিধাত্রী।

এতক্ষণ আমরা দেবীর ধ্যানমন্ত্রোক্ত রূপবর্ণনায় সবই পেলাম, শুধু একটি বিষয় বাদে। সেটি হল তাঁর নামকরণের যথার্থতা—তাঁর জগদ্ধারণ। নামে জগদ্ধাত্রী, অথচ চারখানি হাতে অন্যান্য জিনিস। এত বড় একটা জগতকে না হাতে ধরছেন, না কোলে, না কাঁখে। তাহলে ধরছেন কোথায়?

দেবী জগদ্ধাত্রী নিরন্তর জগতকে ধারণ করে রয়েছেন—হাতে কোলে বা কাঁখে নয়—গর্ভে। কীভাবে? এর উত্তর দিতে গেলে একটু স্বাধীনতার আশ্রয় নিতে হবে। দেবীর ধ্যানে আমরা দেখেছি, তিনি 'ত্রিবলীবলয়োপেত-নাভিনালমৃণালিনী'। ত্রিবলীর অর্থ উদরের উপরে অবস্থিত তিনটি রেখা। এই রেখাত্রয়কে প্রাচীন ভারতের নন্দনতত্ত্ব অনুযায়ী সৌন্দর্যসূচক বলে মনে করা হয়। দেবীর নাভিপদ্মকে ঘিরে সৃষ্টি হয়েছে ত্রিবলীরূপ তিনটি বলয়। সেগুলি শোভা পাচ্ছে নাভিপদ্মের মৃণালের মতো রোমাবলির সঙ্গে যুক্ত হয়ে। এই হল বাহ্যিক অর্থ। এবার গূঢ়ার্থ অন্বেষণ করা যাক। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 'বঙ্গীয় শব্দকোষ'-এ জানাচ্ছেন, নাভিনালের অর্থ—'ভ্রূণের নাভিসংলগ্ন নাড়ী (umbilical cord)'। এই নাভিনালের দ্বারাই মা ও তাঁর গর্ভস্থ সন্তান সংযুক্ত থাকেন। তাহলে যদি বলি, জগদ্ধাত্রীর ত্রিবলী আসলে স্বর্গ-মর্ত-পাতাল এই ত্রিলোক এবং তা আসলে বলয়াকারে দেবীর উদরের বহির্ভাগে নয়, গর্ভের অভ্যন্তরে বিরাজমান—তাহলে অসংগত হয় কি? 'ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ডোদরী' জগন্মাতা তাঁর নাভিনালরূপ মৃণালের দ্বারাই ধরে রেখেছেন সমগ্র ত্রিলোক। নাভির আর একটি অর্থ হল কেন্দ্র। জগদ্ধাত্রী স্বয়ং দ্যাবা-পৃথিবী-রসাতল অর্থাৎ স্বর্গ-মর্ত-পাতালের কেন্দ্রবিন্দুরূপা।

এই সূত্রে আর একটি কথাও না বললেই নয়।

তত্ত্বগতভাবেই জগদ্ধাত্রীর জগৎ-ধারণ বাহ্যত পরিদৃশ্যমান হওয়ার কথা নয়। 'শ্রীশ্রীচণ্ডী'র 'নারায়ণীস্তুতি'তে ভগবান যজ্ঞবরাহের শক্তিরূপা দেবী বারাহীর উল্লেখ—

''গৃহীতোগ্রমহাচক্রে দংষ্ট্রোদ্ধৃতবসুন্ধরে।
বরাহরূপিণি শিবে নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥''

বারাহী যেমন 'দংষ্ট্রোদ্ধৃতবসুন্ধরা', জগদ্ধাত্রী তেমন স্থূলরূপে বিশ্বধারিণী নন। তাঁর জগৎ-ধারণের সূক্ষ্ম তাৎপর্য প্রকাশ পেয়েছে জগদ্ধাত্রী-স্তোত্রের একদম প্রথম চরণেই—''আধারভূতে চাধেয়ে ধৃতিরূপে ধুরন্ধরে।'' অর্থাৎ জগদ্ধাত্রী একাই আধার, আধেয়, ধৃতি এবং ধুরন্ধরা। যিনি ধারণ করছেন, যাকে ধারণ করছেন, যে-আধারে ধারণ করছেন এবং যে-শক্তিতে ধারণ করছেন—সবটাই জগদ্ধাত্রী স্বয়ং। তাঁর বাইরে আর কোনও কিছুরই কোনও অস্তিত্ব নেই। আমাদের যেমন একটি হাত দিয়ে অন্য হাতকে ধরে রাখতে হয় না, কারণ হাতটি আমাদের সামগ্রিক অস্তিত্বেরই একটি অংশ, তেমনই তাঁকেও আলাদা করে লোক দেখিয়ে জগৎ ধরতে হয় না। আমাদের হাত যেমন শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে যায় না, জগৎও তাঁর আশ্রয় থেকে কদাপি বিচ্যুত হয় না।

দেবী জগদ্ধাত্রীর নিবাস কোথায়? কেন, শিবগৃহিণী যখন, তখন কৈলাসেই! হ্যাঁ, কৈলাসে পার্বতীরূপে তিনি অবস্থিতা তো বটেই, কিন্তু তাঁর স্বতন্ত্র একটি পরমধামও রয়েছে। জগদ্ধাত্রীস্তোত্রে কাব্যিকভাবে বলা হয়েছে—''অগম্যধামধামস্থে মহাযোগীশহৃৎপুরে।'' তিনি অগম্যধামবাসিনী তথা মহাযোগীশ শিবের (এবং শিবতুল্য সাধকের) হৃদয়পুরনিবাসিনী। দেবীর সেই অগম্য পরমধামের নাম রত্নদ্বীপ, যার উল্লেখ দেবীর ধ্যানমন্ত্রেও আমরা পেয়েছি। এই রত্নদ্বীপের বিস্তৃত বিবরণ রয়েছে 'মহাভাগবত'-এর তেতাল্লিশতম অধ্যায়ে। শ্রীরামচন্দ্রের প্রশ্নের উত্তরে লোকপিতামহ ব্রহ্মা এই দেবীধামের বর্ণনা দিয়েছেন।

সেই বর্ণনায় যাওয়ার আগে একটি স্পষ্টীকরণ জরুরি। মহাভাগবতপুরাণের এই অংশে দেবীকে প্রত্যক্ষত জগদ্ধাত্রী না বলে মহাদুর্গা বলা হয়েছে। সেক্ষেত্রে দেবীর পরিচয় নিয়ে সংশয় দেখা দেওয়া স্বাভাবিক। এই সংশয়ের তিনটি নিরসন।

এক, মহাদুর্গা জগদ্ধাত্রীর নামান্তর।

দুই, পূর্ববর্তী বিয়াল্লিশতম অধ্যায়ে ত্রিদেবকর্তৃক দেবীস্তুতিতে দেবী পুনঃপুনঃ আখ্যাতা হয়েছেন—''জগতাং ধাত্রি প্রসীদাম্বিকে'' বলে।

তিন, পঞ্চাশতম অধ্যায়ে কৃষ্ণ-যোগমায়ার জন্মপ্রসঙ্গে দেবীকে স্পষ্টতই 'জগদ্ধাত্রী' বলা হয়েছে। ''বিধাভূত্বা জগদ্ধাত্রী ভূভারস্য নিবৃত্তয়ে॥''

ফিরে আসি দেবীধামের প্রসঙ্গে। দেবী মহাদুর্গা মহেশ্বরী কোথায় অবস্থান করেন—শ্রীরামচন্দ্রের এই প্রশ্নের উত্তরে ব্রহ্মা বললেন, দেবী সর্বগা, সর্বসংস্থা এবং বিশেষত পীঠবাসিনী। তিনি ব্রহ্মাণ্ডের ভিতরে বাহিরে—উভয়তই বিরাজমানা। তিনি স্বর্গে, মর্তে, হিমালয়ে ও কৈলাসে শিবসন্নিধানে আছেন। শিবলোকের বামে যে-মনোরম গৌরীলোক

অবস্থিত, সেখানে তিনি অতসীকুসুমবর্ণা সিংহবাহিনী দশভুজা মূর্তিতে বিরাজ করেন। এটি দেবীর বৈদিকী মূর্তি। আর তান্ত্রিকী মূর্তি ব্রহ্মাণ্ডবাহ্যে সর্বোচ্চ রত্নদ্বীপ ধামে বিরাজিত। রত্নদ্বীপ সুধাসাগরবেষ্টিত এবং কল্পবৃক্ষ সমাকীর্ণ। এই ধামে বসন্ত ভিন্ন অন্য ঋতু নেই। গঙ্গা এখানে সর্বদা স্বাদুজলা এবং এখানকার দেবাংশজাত পক্ষীরা দেবীগানে রত। রত্নদ্বীপের মধ্যস্থলে দেবীপুর। রত্নদণ্ড ও ত্রিশূলধারী শত শত ভৈরব-ভৈরবী দ্বারা এই পুর পরিরক্ষিত। পুরমধ্যে দেবীর অন্তঃপুর। ওই পুরদ্বার রক্ষা করেন দেবীর দুই পুত্র গণপতি এবং কার্তিকেয়। সেই অন্তঃপুরে মণিমণ্ডপে বিদ্যুৎপুঞ্জসমপ্রভ এক রত্নসিংহাসন। তাতে মহাসিংহবাহনে ত্রিজগন্মাতা মহাদুর্গা বিরাজমানা। তিনি চতুর্ভুজা, রক্তবস্ত্রা, সালংকারা এবং কোটিচন্দ্রসমপ্রভা। মহাদেবীর সম্মুখে মহাব্রহ্মা, মহাবিষ্ণু ও মহামহেশ কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান এবং স্তুতিরত। দেবীর দক্ষিণে জয়া এবং বামে বিজয়া অতিরম্য চামরদ্বারা বীজনরতা। দেবীর দক্ষিণে বিচিত্রপদ্মহস্তা লক্ষ্মী অগুরুগন্ধাদি সৌগন্ধ দ্রব্য প্রদান করছেন এবং বামপার্শ্বে বীণাবাদিনী সরস্বতী দেবীর বেদাগমসম্মত স্তুতিগীতি করছেন, অপরাজিতা প্রমুখ দেবীগণ শুদ্ধরত্নময় পাত্রে দেবীকে সুধা পরিবেশন করছেন এবং নন্দিনী প্রমুখ শক্তিগণ দেবীকে দান করছেন তাম্বুল। দেবীর অংশসম্ভূতা সাবিত্রী ও গায়ত্রীও সেখানে আছেন। এই দেবীই সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের কারণ এবং এঁর দর্শনলাভের জন্য কোটি কোটি ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর পুরমধ্যে ধ্যানপরায়ণ।

মহাভাগবতপুরাণে মহাদুর্গা জগদ্ধাত্রীর এবং তাঁর পরমধাম রত্নদ্বীপের এই মনোহর বর্ণনা থেকে দেবীর সার্বভৌম একচ্ছত্র সর্বাতিশায়ী স্বরূপটি প্রতিভাত হয়। প্রতিষ্ঠিত হয় তাঁর ত্রিভুবন-মহাসম্রাজ্ঞী সত্তা।

মায়াতন্ত্র অনুযায়ী জগদ্ধাত্রীর নবশক্তি হলেন প্রভা, মায়া, জয়া, সূক্ষ্মা, বিশুদ্ধা, নন্দিনী, সুপ্রভা, বিজয়া এবং সর্বসিদ্ধিদা। এছাড়াও জগদ্ধাত্রীর আবরণদেবতারূপে পূজিত হন বহুলা, কালী, উমা, শূলধারিণী, খেচরী, দ্বারবাসিনী, সুগন্ধা, সর্বসাধিনী, চণ্ডিকা, সৌভদ্রিকা, অশোকবাসিনী, বজ্রধারিণী, মহাবাণী, জগন্মাতৃকা, ললিতা, সিংহবাহিনী, ভগবতী, বিন্ধ্যবাসিনী, মহাবলা, ভূতলবাসিনী প্রমুখ দেবীগণ। জগদ্ধাত্রীর দক্ষিণে পূজিত হন তাঁর ভৈরব—শ্রীনীলকণ্ঠ শিব। ধ্যানানুযায়ী তিনি অযুত প্রাতঃসূর্যের ন্যায় তেজস্বী। তাঁর জটাজূটে উজ্জ্বল চন্দ্রকলা। নাগরাজ তাঁর শিরোভূষণ। হস্তচতুষ্টয়ে জপমালা, ত্রিশূল, কপাল এবং খট্বাঙ্গ। তিনি ত্রিনেত্র, পঞ্চানন এবং সুন্দর। পরিধানে ব্যাঘ্রচর্ম এবং পদ্মের উপর তিনি সমাসীন।

জগদ্ধাত্রীর বার্ষিকী মহাপূজা দুই প্রকারে করা হয়ে থাকে। হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ তাঁর ‘স্মৃতিচিন্তামণি’ গ্রন্থে লিখেছেন, ‘‘অথ জগদ্ধাত্রী-পূজা। তত্র কল্পদ্বয়ম্, তত্র প্রথমঃ কার্ত্তিকশুক্ল-সপ্তম্যাদিনবমীপর্য্যন্ত-তিথিত্রয়ে পূজাত্রয়ং দশম্যাং বিসর্জ্জনঞ্চ।... দ্বিতীয়ঃ কল্পস্তু কেবল কার্ত্তিকশুক্ল-নবম্যাম্।’’[১০] অর্থাৎ প্রথম কল্প হল কার্তিক মাসের শুক্লপক্ষের সপ্তমী থেকে নবমী পর্যন্ত তিনটি তিথিতে পূজা এবং দশমীতে বিসর্জন। আর দ্বিতীয় কল্প হল কেবল নবমীতে পূজা এবং দশমীতে বিসর্জন। এক্ষেত্রে নবমীতেই তিন তিথির পূজা এক দিনে হবে। জগদ্ধাত্রীর দুই রাজধানী চন্দননগর এবং কৃষ্ণনগরে যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় কল্পানুযায়ী পুজো হয়।

জগদ্ধাত্রীপূজা প্রসঙ্গে দুটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য। প্রথমত, জগদ্ধাত্রী শাক্তাচারপ্রিয়া রাজসিক দেবী। তাঁর পূজায় আড়ম্বর আছে। রাজবংশ বা ধনাঢ্য পরিবারেই তাঁর আরাধনার প্রচলন বেশি। কিন্তু আড়ম্বর যতই থাক, অহংকার দেবীর পছন্দ নয়। দেবীর বিশেষ একটি লীলার মধ্য দিয়েই সেই বার্তা

স্পষ্ট। কাহিনিটি সর্বজনবিদিত হওয়ায় অতি সংক্ষেপে উল্লেখ করছি। কেনোপনিষদের একটি আখ্যানে দেবগণ একদা ব্রহ্মশক্তির প্রভাবে বলীয়ান হয়ে অসুরজয় করে নিজেদের শক্তিতেই মদমত্ত হয়ে পড়লেন। ভাবখানা এমন যে—আমাদেরই বিজয়, আমাদেরই মহিমা। দেবগণের এই দর্প ব্রহ্মবিদ্যাস্বরূপিণী উমা হৈমবতী একটি তৃণের দ্বারা চূর্ণ করলেন। দেবগণ বুঝলেন, ব্রহ্মশক্তি ছাড়া তাঁরা একটি নগণ্য তৃণকেও দগ্ধ করতে বা উড়িয়ে নিতে সক্ষম নন। এই হৈমবতী উমাই কাত্যায়নীতন্ত্রের জগদ্ধাত্রী। সেখানে একইভাবে জগদ্ধাত্রী দেবগণের অহং নাশ করছেন।

এই কাহিনি জগদ্ধাত্রীপূজার মূল ভাবটিকে সুন্দরভাবে প্রকাশ করে। ধনবল-জনবল যতই থাক, দেবীর পূজায় আয়োজন ও আড়ম্বর যতই হোক, সাধককে মনে রাখতে হবে, সবই ব্রহ্মশক্তির ক্রিয়া। তিনি কৃপা করে পুজো নিচ্ছেন, তাই পুজো হচ্ছে। স্বয়ং দেবগণ যাঁর ইচ্ছা ভিন্ন একগাছি ঘাসকে কব্জা করতে পারেন না, তাঁর কাছে রাজারাজড়া তো তুচ্ছ! জগদ্ধাত্রীর আরাধনা এভাবে বিপুল ঐশ্বর্যের মাঝেও বিনয়ের, সমর্পণের, নিরহংকারের শিক্ষা দেয়।

এবার দ্বিতীয় বিষয়। আশ্বিন ও কার্তিক মাস জুড়ে শিবজায়া মহাশক্তি তিনটি রূপে পূজা গ্রহণ করেন—দুর্গা, কালী ও জগদ্ধাত্রী। জগদ্ধাত্রীপূজার প্রসার ও ব্যাপকতা দুর্গা ও কালীর অনুরূপ না হলেও তত্ত্বত তিন দেবীই এক। আর এই একতার প্রমাণ আমরা দেখতে পাই জগদ্ধাত্রী পূজা-সংক্রান্ত দুটি আখ্যানে। একটি অষ্টাদশ শতকের প্রেক্ষাপটে, অন্যটি উনিশ শতকের। একটি আখ্যানের কেন্দ্রে পুরুষ। এক প্রবল সম্পন্ন রাজা কৃষ্ণচন্দ্র। অন্যটিতে নারী। দরিদ্র-গৃহিণী শ্যামাসুন্দরী দেবী।

কিংবদন্তি অনুসারে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র বকেয়া রাজস্বের কারণে নবাব আলিবর্দি খাঁর কারাগারে বন্দি হয়েছিলেন। মুক্তি পেলেন দুর্গাপূজা অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়ার পর। ''সেই বছর দুর্গাপূজার অনুষ্ঠান করতে না পারায় মহারাজা দুঃখে কাতর হওয়ায়, দেবী দুর্গা তাঁকে জগদ্ধাত্রী মূর্তিতে দেখা দিয়ে একমাস পরে কার্তিক মাসের শুক্লপক্ষের নবমী তিথিতে জগদ্ধাত্রীপূজার নির্দেশ দিয়েছিলেন।''[১১]

অন্যদিকে জয়রামবাটীর শ্যামাসুন্দরী দেবী (শ্রীমা সারদার গর্ভধারিণী) একবার গ্রামের কালীপূজার সময়ে নব মুখুজ্যের সংকীর্ণতার কারণে নৈবেদ্যের চাল দিতে পারলেন না। সারারাত কেঁদে কাটালেন এই বলে যে, এই কালীর চাল কে খাবে। অতঃপর স্বপ্নে দেখলেন এক রক্তবর্ণা দেবীকে। তিনি বলছেন, ''তুমি কাঁদছ কেন? কালীর চাল আমি খাব। তোমার ভাবনা কী?'' শ্যামাসুন্দরী জিজ্ঞাসা করলেন, ''কে তুমি?'' জগদ্ধাত্রী উত্তর দিলেন, ''আমি জগদম্বা, জগদ্ধাত্রীরূপে তোমার পূজা গ্রহণ করব।''[১২]

এই দুটি অতিপরিচিত আখ্যানের মধ্যে ভাবগত এক গভীর সম্পর্কসূত্র আছে বলে মনে হয়। পুরুষ-নারী, ধনী-দরিদ্রের 'বাইনারি' সরিয়ে দিলে দেখা যাবে, দুটি কাহিনি আসলে একই ভাবসত্যকে প্রতিপন্ন করে। কৃষ্ণচন্দ্রের কাছে জগদ্ধাত্রী এসেছেন দুর্গার বিকল্প হিসেবে। শ্যামাসুন্দরীর কাছে কালীর। যথাক্রমে দুর্গা ও কালীর পুজো করতে বা পাঠাতে না পারার কষ্ট তাঁদের ধুয়ে গেছে জগদ্ধাত্রীকে পেয়ে। এই প্রসঙ্গে স্মরণ করব মায়াতন্ত্রের বচন : ''যা কালী সা মহাদুর্গা যা দুর্গা সৈব তারিণী॥''[১৩] কালী, দুর্গা এবং মহাদুর্গা (জগদ্ধাত্রী) যে একই—তা শাস্ত্র না পড়েও হৃদয়ঙ্গম করা যায় এই প্রচলিত কিংবদন্তি বা আখ্যানগুলির দ্বারা।

রইল বাকি এক। কিন্তু সেই একজনের কথা না বললে জগদ্ধাত্রী-পরিক্রমা শেষ হবে না। তিনি করীন্দ্রাসুর। জগদ্ধাত্রীর বাহন সিংহের পদতলে যে-হস্তীটি দেখতে পাওয়া যায়, তিনিই করীন্দ্র। করী+ইন্দ্র, অর্থাৎ গজশ্রেষ্ঠ। এই অসুরের প্রকৃত পরিচয়

বহুভাবে কল্পিত হয়েছে। কেউ বলেছেন ইনি মহিষাসুরেরই হস্তিরূপ। কেউ বলেছেন হস্তী আসলে মদমত্ত চঞ্চল মনের প্রতীক। করীন্দ্রাসুরের জন্ম ও বধবৃত্তান্তের সংক্ষিপ্ত অথচ আকর্ষণীয় বর্ণনা পাচ্ছি নন্দকুমার কবিরত্ন-রচিত 'শ্রীশ্রীকালী কৈবল্যদায়িনী' গ্রন্থে। গঙ্গা-অবতরণের সময়ে দেবী গঙ্গাকে লাভ করতে ইচ্ছা করেন ইন্দ্রবাহন ঐরাবত। গঙ্গা ইন্দ্রের জননীতুল্যা। তাই কুপিত দেবরাজ নিজ বাহনকে অসুরাংশে হস্তিনীগর্ভে জন্ম নেওয়ার অভিশাপ দেন। ক্রন্দনরত ঐরাবত শাপমুক্তির উপায় জিজ্ঞাসা করলে,

''ইন্দ্র কহে মহামায়া হবে জগদ্ধাত্রী কায়া
হরি হবে তাঁহার বাহন।
নখর প্রহারে তার তব কুম্ভ হবে দার
মুক্ত হবে শাপেতে বারণ।''[১৪]

মহামায়া জগদ্ধাত্রীরূপ ধারণ করলে তাঁর বাহন সিংহরূপ নারায়ণ যখন নিজ নখাঘাতে করীন্দ্রের কুম্ভবিদারণ করবেন, তখন তাঁর শাপমোচন—এই ছিল ইন্দ্রের প্রতিবিধান। ওদিকে মর্তলোকে এক হস্তিনীর গর্ভে করীন্দ্রের জন্ম হয়েছে। কালক্রমে করীন্দ্রাসুর অসুররাজ দুর্গাসুরের সেনাপতিত্ব লাভ করে এবং দেবীবাহন সিংহের দ্বারা বিদীর্ণকুম্ভ হয়ে শাপমুক্ত হয়।

মহাশক্তি দেবীর অসংখ্য অসুরনাশের অসংখ্য কাহিনি বিদ্যমান। কিন্তু করীন্দ্রাসুর-বধ একটু স্বতন্ত্র। দেবী এখানে স্বয়ং অসুরবধ করেন না। মূর্তিতে ও কাহিনিতে—উভয়তই দেখি, বাহন সিংহের দ্বারা তিনি করীন্দ্রবধ করান। দুর্গারূপে তিনি যদিও বা বামপাদের অঙ্গুষ্ঠমাত্র দ্বারা মহিষাসুরকে স্পর্শ করেন, জগদ্ধাত্রীরূপে সেইটুকুও করেন না।[১৫] এমনকী জগদ্ধাত্রীর যে-আয়ুধসমূহ—ধনুর্বাণ ও চক্র—তাও নিক্ষেপাত্মক। খড়্গ বা ত্রিশূলের মতো সেগুলি ব্যবহার করতে প্রতিপক্ষের শারীরিক নৈকট্যের প্রয়োজন পড়ে না। সব মিলিয়ে দেখা যায়, মহাবিদ্যা ব্রহ্মবিদ্যাস্বরূপিণী জগদ্ধাত্রী অবিদ্যার লেশমাত্র সংস্পর্শ সহ্য করেন না। অসুর-সংহার তাঁর গৌণ লীলামাত্র। নিখিল ভুবনের একচ্ছত্র ঈশ্বরী তথা চরাচর ব্রহ্মাণ্ডের জননী তিনি—এই-ই তাঁর মুখ্য পরিচয়। ✠

তথ্যসূত্র

১। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, *বঙ্গীয় শব্দকোষ*, সাহিত্য অকাদেমি, কলকাতা, ২০০৪, খণ্ড ১, পৃঃ ৯১৬ [এরপর, *বঙ্গীয় শব্দকোষ*]
২। সম্পাদনা : জ্যোতির্লাল দাস, *মায়াতন্ত্রম্*, নবভারত পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৪১৯, পৃঃ ১০-১১ [এরপর, *মায়াতন্ত্রম্*]
৩। নুটুগোপাল তন্ত্ররত্ন সঙ্কলিত ও প্রকাশিত, *ধর্মানুষ্ঠান*, মুর্শিদাবাদ, ১৯১৪, পৃঃ ৮৯
৪। *বঙ্গীয় শব্দকোষ*, খণ্ড ২, পৃঃ ১২৫৩
৫। তদেব
৬। Ed. Swami Tapasyananda, Sri Lalita Sahasranama, Sri Ramakrishna Math, Madras, 2018, p. 90
৭। *ধর্মানুষ্ঠান*, পৃঃ ১০৩
৮। *মায়াতন্ত্রম্*, পৃঃ ৪
৯। সম্পাদনা : পঞ্চানন তর্করত্ন, *শ্রীমহাভাগবতম্*, নবভারত পাবলিশার্স, ১৯৯৫, পৃঃ ১৭৯
১০। হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য, *স্মৃতিচিন্তামণিঃ*, বিশ্ববাণী প্রকাশনী, কলকাতা, ১৪২৫, পৃঃ ৩৯
১১। অলোক কুমার চক্রবর্তী, *মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ*, গ্রন্থমিত্র, কলকাতা, ২০১৫, পৃঃ ১৯৩
১২। দ্রঃ স্বামী গম্ভীরানন্দ, *শ্রীমা সারদা দেবী*, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ১৪১৯, পৃঃ ৪৯
১৩। *মায়াতন্ত্রম্*, পৃঃ ৭৯
১৪। সম্পাদনা মোহনচাঁদ শীল ও অভিজিৎ শীল, নন্দকুমার কবিরত্ন রচিত, *শ্রীশ্রীকালী কৈবল্যদায়িনী*, তারা লাইব্রেরি, কলকাতা, ১৪২১, পৃঃ ১১৭
১৫। দুর্গা ও জগদ্ধাত্রীর এই বিশেষ পার্থক্যটি সমাজমাধ্যমে লিখেছিলেন প্রান্তিক গুপ্ত